প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়

দীপংকর বর

পরিবেশগত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতি-নির্ধারণে গুরুত্ব আরোপ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয়তা বাড়াতে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি প্রতিবছরের মতো এবারও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ পালন করছে। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য “এন্ডিং প্লাস্টিক পল্যুশন” বাংলায় যার ভাবানুবাদ ''প্লাস্টিক দূষণ আর নয়’ এবং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে: “বিট প্লাস্টিক পল্যুশন” - যার বাংলা ভাবানুবাদ ‘প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়’ । এবারের প্রতিপাদ্য মানবসভ্যতা, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে আন্তর্জাতিক কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা জোরদারের পাশাপাশি বাংলাদেশেও পরিবেশ বিষয়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্লাস্টিক ব্যবহারের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনিক উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্যের বড়ো অংশ নদী, খাল, জলাশয় এবং শহরের রাস্তায় জমা হচ্ছে। এদের মধ্যে বৃহৎ অংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক আকারে পানিতে মিশে জলজ জীবনকে বিঘ্নিত করার পাশাপাশি খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে। ঢাকার মতো প্রধান শহরে মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহার ২০১০ সালের মাত্র ৩ কেজি থেকে ২০২৩ সালে ৯ কেজিরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রবণতা কেবল পরিবেশের নয়, জনস্বাস্থ্যের জন্যও ভয়াবহ। এগুলি মাটির উর্বরতা নষ্ট করে, পরিবেশে দূষণের মাত্রা বাড়ায় । এই পরিস্থিতিতে কোনো পরিকল্পিতভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা না নিলে জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, মৃত্তিকা দূষণ এবং জীবাণুমুক্ত পানির অভাবের মতো সংকট আরও বেশি ঘনীভূত হবে।

প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণের ভয়াবহতা অনুধাবন করে এ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে পলিথিন শপিং ব্যাগ ও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক) নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুপার শপগুলোতে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে এবং অন্যান্য মার্কেটেও তা বন্ধের কার্যক্রম চলছে। এর পাশাপাশি বাজার মনিটরিং, জনসচেতনতা কার্যক্রম ও ক্লিন-আপ ক্যাম্পেইন চালানো হচ্ছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ অনুসরণে এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপনসিবিলিটি গাইডলাইন ও থ্রি আর (প্রডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল) নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৭টি পণ্যকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ৩টি পণ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এ বিষয়ে মনিটরিং ও আইন প্রয়োগ জোরদার করা হয়েছে। বৈশ্বিকভাবে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতিসংঘের পরিবেশ এসেম্বলির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নের কাজ চলছে।

অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার আইন প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। ০৩ নভেম্বর ২০২৪ হতে এ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ৪১৬টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৭৮৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার ৩ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায়সহ আনুমানিক ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৯০৫ কেজি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। পলিথিন বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। ২০২৫ সালের ০২ জানুয়ারি থেকে ০২ জুন পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে পরিবেশ দূষণ রোধে ৯৯৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। এসব অভিযানে ২ হাজার ৩৬১টি মামলার মাধ্যমে মোট ২৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৯ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানসমূহে ৪৭৯টি ইটভাটার চিমনি ভেঙে সম্পূর্ণ কার্যক্রম বন্ধ, ২১৬টি ভাটা বন্ধে নির্দেশনা, ১৩২টি ভাটার কাঁচা ইট ধ্বংস, ১৫টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ২ জনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৮টি ট্রাক সীসা/ব্যাটারি গলানোর যন্ত্রপাতি জব্দসহ কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। এসকল কার্যকর করতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারের মতো ক্ষেত্রগুলোতে নীতিমালার ভিত্তিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তবে বাস্তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের অপ্রতুল জনবল ও সীমিত বাজেট, গবেষণা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে দুর্বলতা, সমন্বয়ের অভাব এবং নাগরিক সচেতনতার ঘাটতি এখনো মূল প্রতিবন্ধকতা। শহরাঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করতে পারেনি। ফলে দৈনিক প্রায় ২৫ হাজার টনের বেশি কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ছাড়াই রাস্তায়, খালে ফেলা হচ্ছে–যা পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকি তোলে। বাংলাদেশে প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগ শুরু হলেও তা এখনও অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্লাস্টিক বর্জ্য অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় সরাসরি পোড়ানো হয়, যা বায়ুদূষণের ঝুঁকি বাড়ায় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলে। প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে আধুনিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট তৈরি বা আধুনিক না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো রিসাইক্লিং ইউনিটগুলোর কার্যকারিতা অপর্যাপ্ত।

পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষার প্রসার জরুরি। স্কুল-কলেজে পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ের আওতায় কিছু ধারণা উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু প্লাস্টিক দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারের মতো অত্যাবশ্যক বিষয়গুলো পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায় না। ফলে নতুন প্রজন্ম প্লাস্টিক ব্যবহারের প্রতিকূল দিকগুলোর সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিচিত নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে ঠিকই, তবে তা কখনো কখনো দ্রুত তথ্যের অতিপ্রবাহে হারিয়ে যাচ্ছে। মাঠ

পর্যায়ে এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্লাস্টিক দূষণ রোধে ধারাবাহিকতা খুব কম। বাংলাদেশের পরিবেশ আইনকানুন থাকলেও বাস্তবায়ন করে তোলা এবং সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিই বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পরিবেশ আদালত এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কার্যকর সমন্বয় ও তথ্যভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থায় দক্ষতা বাড়াতে আধুনিক বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ ও পয়েন্ট গড়ে তোলা জরুরি। এতে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় প্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করে ট্রেনিং ও বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

সিঙ্গেল-ইজ প্লাস্টিক বন্ধে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে হবে। পলিথিন ব্যাগের বদলে বিকল্প হিসেবে কম্পোস্ট্যাবল বা পাট থেকে তৈরি ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়াতে ভর্তুকি, কর ছাড় বা প্রণোদনা দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ছোটো ও মাঝারি শিল্পীদের (এসএমই) জন্য আকর্ষণীয় ঋণ স্কিম প্রণয়ন করে তাদেরকে পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরি ও বাজারজাত করতে সাহায্য করতে হবে। বর্তমান সরকার ভর্তুকি মূল্যে পাটের ব্যাগ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। দোকানদার-ভোক্তাদের সচেতন করতে বিনামূল্যে 'কম্পোস্ট্যাবল ব্যাগ' বিতরণ অভিযান চালানো যেতে পারে।

প্রতিটি পরিবেশ সংস্কারে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। শিল্প মালিকদের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও পরিষ্কার উৎপাদন প্রক্রিয়া অবলম্বনে উৎসাহিত করতে কর ছাড় পুরস্কার বা প্রশংসাপত্র প্রদান করা যেতে পারে। এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সচেতনতা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করলে সাধারণ মানুষ সচেতন হতে পারে। মিডিয়া, বিশেষ করে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে প্লাস্টিকমুক্ত কর্মসূচি প্রচার ও পরিবেশবান্ধব পণ্যের ইতিবাচক দিক তুলে ধরতে ভূমিকা পালন করতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ প্রোগ্রাম, প্রতিবেদন ও ফিচার প্রচার করে নাগরিকদের প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা যেতে পারে।

নাগরিক পর্যায়ে প্রতিটি বাড়ি, অফিস এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ' প্লাস্টিক মুক্ত' কার্যক্রম চালিয়ে সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে টেকসই মেলা বা কর্মশালা আয়োজন করে প্লাস্টিক বিকল্প পণ্যগুলো তুলে ধরার মানচিত্র তৈরি করা যেতে পারে। বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করার জন্য রিসাইক্লিং শিল্প ও পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) আধুনিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার আশপাশের শিল্পাঞ্চলে আর্থিক সহায়তা দিয়ে কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হাব গড়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে পেট্রোকেমিক্যাল বা শিল্প পর্যায়ের প্রাথমিক কাঁচামাল হিসেবে পুনর্ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, জৈব প্লাস্টিক তৈরির নতুন গবেষণা ও উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণা সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। পরিবেশবান্ধব স্টার্টআপগুলোকে সহায়তা দিতে বিশেষ তহবিল গঠন করে তারা যেমন উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করে, তেমনি ধাপে ধাপে শিল্পায়ন বাড়ায়।

বাংলাদেশকে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকায় নেমে কাজ করতে হবে। গ্লোবাল প্লাস্টিক ট্রিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষের কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে, যাতে আমরা বৈশ্বিক মানচিত্রে পিছিয়ে না পড়ি। আন্তর্জাতিক আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক –এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে নীতি-নির্ধারণ, প্রযুক্তি, অর্থায়ন ও জনসচেতনতার সমন্বিত প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমান গতিতে অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্লাস্টিক বর্জ্য কমানো, সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং পরিবেশ সংস্কারের কাজে অংশগ্রহণ করা। যদি সরকার পরিবেশ বিষয়ক আইন বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করে, নাগরিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পখাত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়, তবে "প্লাস্টিক দূষণ আর নয়" কেবল একটি স্লোগান নয়, একটি বাস্তবতা হয়ে উঠবে। সরকার, নাগরিক সমাজ ও শিল্পখাতের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সবুজ, টেকসই ও জীবন্ত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার পথে আমরা কারিগরি, নীতিগত ও সামাজিক আঙ্গিনায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সার্বিকভাবে, "প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়"–এর ডাককে প্রত্যেকে আমাদের জীবনধারার অঙ্গীকার হিসেবে গড়ে তুলি। জাতি হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এমন পরিবেশ উপহার দিতে হবে, যেখানে প্লাস্টিক দূষণ আর দারুণ কোনো ভয়াবহ চিত্র উপস্থাপন করবে না। আমাদের আজকের সংকল্পই দৃঢ় ও সহনশীল পরিবেশের পথে পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে।

#

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার